

সাক্ষাৎকার

প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন স্বনামধন্য প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে এই কলেজের কতিপয় অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্র সাক্ষাৎ করে কলেজের সেকাল ও একাল সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপচারী হয়েছিলেন। আলোচনার সময়ে সাক্ষাৎকারীদের প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রবীণ শিক্ষাব্রতীদের বক্তব্যগুলি এখানে বিবৃত হয়েছে।

অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

সাক্ষাৎকারী :

পরিমলকৃষ্ণ সেন* ও মনোতোষ দাশগুপ্ত**

● প্রশ্ন : আপনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন্ সালে যোগ দেন এবং তখন রসায়ন বিভাগে অন্য কোন্ কোন্ অধ্যাপক ছিলেন? এখানে আসার আগে আপনি আর কোন্ কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন?

● উত্তর : আমি ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষাবর্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছিলাম – সঠিক তারিখটা স্মরণে নেই। তার আগে আমি বিদ্যাসাগর কলেজে সাড়ে তিন বছর এবং কুচবিহার কলেজে ও রাজশাহী কলেজে স্বল্পকাল ছিলাম। আমি যখন এ কলেজে এলাম, তখন রসায়নের অধ্যাপকপ্রধান ছিলেন ডঃ কুদরৎ-ই-খুদা। তার পরেই ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সেন – তিনি ঢাকা কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন। সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ডঃ সুবোধকুমার মজুমদার, ডঃ নির্মলেন্দুনাথ রায় এবং অধ্যাপক ননীগোপাল চক্রবর্তী। পাঁচ-ছয় জন লেকচারারের মধ্যে প্রবীণ ছিলেন অধ্যাপক দয়ানন্দ ভাদুড়ী যাঁর পিতৃদেব ও পিতৃব্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন এবং এই ল্যাবরেটরী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

● প্রশ্ন : তখন সাধারণভাবে রসায়নের ল্যাবরেটরীর অবস্থা ও কাজকর্ম কেমন ছিল?

● উত্তর : এখানে এসে যেটা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সে হল এখানকার বড় বড় প্রশস্ত সুউচ্চ পরিচ্ছন্ন ল্যাবরেটরী ও সুন্দর লাইব্রেরী, কাজ এবং লেখাপড়ার অপূর্ব সুযোগ। তেতলার ISc ও BSc ল্যাবরেটরী, টিনের ঘরে বিরাট অনার্স ল্যাবরেটরী আর একতলায় স্নাতকোত্তর ক্লাসের ল্যাবরেটরী। সহকর্মী অধ্যাপকদের সহযোগিতায় আমার কাজ সহজ হয়েছিল। অধ্যাপকরা সবাই গুণী ছিলেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং ছাত্রদের যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করতেন। তবু সে সময়ে একটা অভাব ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ভূষে। পেছনের একতলা দালানে

আগে পোস্টগ্রাজুয়েট Physical Chemistry ল্যাবরেটরী ছিল – যুদ্ধের সময়ে সরকার সেই দালানটি দখল করে সেখানে একটা বড় র‍্যাশন-স্টোর করে। যুদ্ধশেষে ১৯৪৫-এ ওরা উঠে চলে গেল। এতদিন কোনো Physical Chemistry ল্যাবরেটরী ছিল না। ওরা রেখে গেল কয়েকশো ছোট ছোট বানরের সাইজের ইঁদুর যাদের দেখে বিভ্রাল পালিয়ে যেত। ঘর বন্ধ করে ক্লোরিন গ্যাস ঢুকিয়ে ইঁদুর তাড়ানো। মেঝের উপরে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু তেল আর ময়লার গাঁদ – আমায় নিজেই দুজন ল্যাব-বয়কে নিয়ে অতিকষ্টে সে সব পরিষ্কার করতে হল। সুস্থ যন্ত্রপাতিগুলো উদ্ধার করে ব্যবহারোপযোগী করতে আমার ৬ মাসের বেশি সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ল্যাবরেটরী চালু হল।

সব ক্লাসেই উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র। তাদের সন্নিহিত চোখে মুখে কৌতুহল আর অনুসন্ধিৎসা, নতুন কিছু শোনা ও জানার আগ্রহ, পাঠ্যপুস্তকে যা আছে তা তারা আগেই অধিগত করেছে। এজন্য আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হত এবং সর্বদা তৈরী থাকতে হত। সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিখরে উঠে খ্যাতিমান হয়েছে – অধ্যাপনায়, গবেষণায়, উপাচার্যরূপে, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী বা প্রশাসনে। তাদের এসব কৃতিত্ব আমার কোনো অবদান নেই। তারা যে একদিন আমার ক্লাসে বসেছিল, সেই আমার অহংকার।

একটা প্রতিকূলতার কথাও বলি। আমি ভৌত রসায়নের ছাত্র – সেটাই অন্যান্য কলেজে পড়িয়ে এসেছি এবং পরেও বহু বছর পড়িয়েছি। কিন্তু যখন এখানে পড়াতে শুরু করলাম, আমাকে একটাও ভৌত রসায়নের ক্লাস দেওয়া হল না – সব ক্লাসেই আমাকে পড়াতে হত ঔষধ রসায়ন, যদিও সে বিষয়ে পড়াবার অনেক অধ্যাপকই ছিলেন। তিন বছর পরে – স্বাধীনতার পরে – আমাকে ভৌত রসায়নের ক্লাস দেওয়া হল।

● প্রশ্ন : আপনি ১৯৬০ পর্যন্ত আঠারো বছর এই কলেজে ছিলেন। নানা অধ্যক্ষ এবং দিকপাল অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের কথা কিছু বলবেন?

● উত্তর : আমি যখন এখানে যোগ দিই, তখন অধ্যক্ষ

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫০-৫৫ (রসায়ন); ** প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫৯-৬১ (রসায়ন)

ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক অর্পূর্বকুমার চন্দ্র । কয় মাস পরেই তিনি চলে গেলেন । তাঁর জায়গায় অধ্যক্ষ হলেন বিশ্বখ্যাত রাশিভবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, এফ-আর-এস । তিনি খুব কমই প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আসতেন; বেকার ল্যাবরেটরীতে সর্বক্ষণ গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন – বেশ কিছু অধ্যাপক তাঁকে দেখেন নি । দুবছর পরে তাঁর জায়গায় এলেন গণিতবিদ জ্যোতির্ময় ঘোষ – তিনি ‘ডাক্তার’ ছদ্মনামে বেশ কিছু সাহিত্য রচনা করে গেছেন । তাঁর অবসর নেবার পর অধ্যক্ষ হলেন যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত – উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক । এর পরে অধ্যক্ষরা হলেন এ.জে.ফ্রেড-পেরেরা এবং সনৎকুমার বসু । এসব অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল । সবাইকেই দেখেছি অত্যন্ত সজ্জন, অমায়িক এবং কর্মনিষ্ঠ ।

রসায়ন বিভাগের কথা আগেই বলেছি । পরে এই বিভাগে এলেন এক প্রবীণ নামী অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত । অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়েই প্রবীণ অনেক দিকপাল অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । তাঁদের পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনার প্রচুর খ্যাতি ছিল । মাত্র কয়েকটি নাম বলি : ইংরেজীতে গ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ; বাংলায় জনার্দন চক্রবর্তী ; ইতিহাসে সুশোভনচন্দ্র সরকার ; সংস্কৃতে সদানন্দ ভাদুড়ী ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী ; অর্থনীতিতে যোগীশচন্দ্র সিংহ ; দর্শনে নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এবং গোপীনাথ ভট্টাচার্য ; গণিতে ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস ও বিতুতি সেন ; পদার্থবিদ্যায় কুলেশচন্দ্র কর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সরোজবন্ধু সান্যাল ; উদ্ভিদবিদ্যায় গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ; এবং আরো অনেকে । যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা কিয়দন্তী অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন । শুধু বৈদ্যে নয়, মানুষ হিসাবেও এঁরা ছিলেন উচ্চস্তরের । এঁদের সরল জীবনযাত্রা, সহজ অমায়িক ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম ।

আমার সমকালীন বা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় বা ছোট অনেক অধ্যাপকও শিক্ষকতায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ করছি : ইংরেজীতে তারকনাথ সেন, অমল কুমার ভট্টাচার্য, সদানন্দ চক্রবর্তী ; অর্থনীতিতে ভবতোষ দত্ত ; বাংলায় হরপ্রসাদ মিত্র, ভূদেব চৌধুরী ; পদার্থবিদ্যায় সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ইতিহাসে অমলেশ ত্রিপাঠী, ওয়াহেব মামুদ, ভূপেন মুখোপাধ্যায় ; শারীরবিদ্যায় সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রাণিবিদ্যায় শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ; ভূবিদ্যায় সন্তোষকুমার রায়, অজিতকুমার সাহা ;

উদ্ভিদবিদ্যায় পরমনাথ ভাদুড়ী ; এবং আরো আরো অনেক ।

● প্রশ্ন : আপনি আসার পরে কলেজে কোনো সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়েছিল কি ?

● উত্তর : খুব বেশি না হলেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে । ১৯৪৪-এ কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয় । প্রথমে ভেবেছিলাম, ছাত্রীরা বিজ্ঞান শাখায় তেমন সুবিধে করতে পারবে না । সেটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল । বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় মেয়েরাই অনেক উচ্চস্থান অধিকার করে নিল ।

কিছুদিন পরে কলেজে রাশিবিজ্ঞান ও ভূগোল বিভাগ খোলা হল এবং ১৯৫১-তে প্রাণিবিদ্যা ।

১৯৪৭ সালে সংস্কৃত বিভাগটিকে এই কলেজ থেকে তুলে সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত করা হল । আরবী-ফার্সি ইত্যাদিকে নিয়ে যাওয়া হল মৌলানা আজাদ কলেজে ।

পাঁচ-এর দশকে প্রথম দিকে প্রায় সব বিভাগে Class । অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল ।

● প্রশ্ন : বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ‘কালচার’ সম্বন্ধে প্রায়ই সমালোচনা হয় । অনেকে বলেন, “আজ প্রেসিডেন্সি কলেজ অনেকক্ষেত্রে পূর্বের সুনাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে । প্রেসিডেন্সি কলেজ আর সেই আগের প্রেসিডেন্সি কলেজ নেই ।” এ বিষয়ে প্রশাসন, শৃঙ্খলা ও শিক্ষকতার দিক থেকে আপনার মতামত কি ?

● উত্তর : এই বিতর্কিত প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেওয়া কঠিন । আমি ৩২ বছর হল কলেজ থেকে চলে এসেছি, এখনকার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানিনা । তবে তোমরা যে সব বিষয়ে উল্লেখ করেছ, আমার সময়ে সেগুলো কিরকম ছিল একটু বলতে পারি ।

তখন প্রশাসনের কাজে অধ্যক্ষকে বিশেষ ভাবে হত না । কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়ে সেগুলো করে দিতেন । অফিসের কাজে সহায়তা করতেন বেশির ভাগ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সুশোভন সরকার । কলেজে দৈনন্দিন প্রয়োজন বা কোনো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিতেন অধ্যাপক সরোজবন্ধু সান্যাল ও সন্তোষ কুমার রায় । অনেক বছরেই কলেজের রুটিন, stipend-এর জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন এবং কলেজে ভর্তির কাজ দেখতে হতো আমাকে । অধ্যক্ষ শুধু সেই করেই খালাস ।

সে সময়ে তো ‘ঘেরাও, দেওয়ালে স্লোগান লেখা’, আমাদের দাবী – এসব ছিল না । কলেজ পরীক্ষায় অতি

কদাচিৎ দু-একটা টোকাটুকির খবর পাওয়া যেত। সুতরাং সে সময়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হত না।

আর পঠন-পাঠনের কথা? অধ্যাপকেরা ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাসে ঢুকতেন। বিজ্ঞান বিভাগে ক্লাস থাকুক বা না থাকুক, অনেকেই বেলা দশটায় কলেজে হাজির হতেন এবং রাত সাটটা পর্যন্ত থাকতেন। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ ছুটি নিতেন না। আমি রসায়ন বিভাগ সম্বন্ধে বলতে পারি, কোনো অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকলে সেই ক্লাসে অন্য একজন যেতেন বা আমি প্রায়ই নিজে গিয়ে সেই ক্লাস নিতাম। কোনো ক্লাসই বাদ পড়ত না। প্রতি মাসে অনার্সের ছাত্রদের একটা পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাতে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। সমস্ত ক্লাসেই পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ করা হত।

কাগজে সংবাদ পড়ে যেটুকু মনে হয়, বর্তমানে আগের আদর্শ থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছে তার প্রধান কারণ কলেজে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও তার প্রাধান্য। আগেও প্রত্যেক অধ্যাপকের এবং ছাত্রের নিজ নিজ রাজনৈতিক ধারণা ও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত – কলেজে প্রশাসন বা পঠন-পাঠন তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। এখন এ অবস্থা নেই।

আর একটা কথা। কৈফিয়ৎ দেবার বাধ্য-বাধ্যকতা (accountability) না থাকলে কর্তব্যে শৈথিল্য আসবেই। তার ফলে নিয়মশৃঙ্খলায় অবনতি ঘটে, যেটা এখন সর্বত্র দেখা যায়। আর যেখানে নিয়মানুবর্তিতা নেই, সেখানে উন্নতি দূরের কথা, অবনতি অবশ্যস্বার্থী।

● প্রশ্ন : প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রভর্তির বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতি কি আপনার সঠিক মনে হয়?

● উত্তর : বর্তমানে এই কলেজে ভর্তির পদ্ধতি কী, আমার জানা নেই। আমার সময়ে কঠোরভাবে মেথার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী নেওয়া হত। IA-ISC-তে প্রাপ্ত নম্বর মেথার মাপকাঠি ছিল – admission test কদাচিৎ নেওয়া হত কোনো কোনো আর্টস বিভাগে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। আমার ঠিক আগের বিভাগীয় প্রধান এবং আমার শ্রদ্ধেয় ডঃ নির্মলকুমার সেনের মেয়ে রসায়নে অনার্স পড়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু তার কিছু নম্বর কম থাকায় তাকে আমি ভর্তি করতে পারি নি।

● প্রশ্ন : বর্তমানে রসায়নে যেভাবে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কী?

● উত্তর : রসায়নের বর্তমান সিলেবাসে ত্রুটি আছে,

তার কিছু পরিবর্তন খুব প্রয়োজন। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের উপরে আরো বেশি জোর দেওয়া দরকার। সেই তুলনায় তাত্ত্বিক দিকটায় অতিরিক্ত নজর দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

আজকাল সব কলেজেই লেকচার ক্লাসে demonstration experiments উঠে গেছে। এতে শিক্ষার মান নেমে গেছে। এগুলি খুব জরুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজে আগে কালীবাবু এসব experiment-এর ব্যবস্থা করতেন – তিনি এবিষয়ে খুব দক্ষ ছিলেন এবং তাঁর কাছে আমি এসব অনেক জিনিস শিখেছিলাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে IA/ISC তথা plus-2 কোর্স উঠে গিয়েছে – কেন, বুঝতে পারি না। কোনো কোনো অধ্যাপক বলেন, plus-2 কোর্স থাকলে উচ্চতর ক্লাসে পঠনপাঠনের মান হ্রাস পায় – কাজের চাপের জন্য। কিন্তু আগে তো IA/ISC ক্লাস ছিল; তখন তো অনার্সের মান হ্রাস পায়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খুবই উচ্ছ্বাস পেয়েছে। এখন তো শিক্ষকসংখ্যাও এই কলেজে দ্বিগুণ হয়েছে। অন্যান্য ভাল কলেজে তো plus-2 কোর্স রয়েছে। তাদের কি পঠন-পাঠনের মান হ্রাস পেয়েছে? প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে plus-2 কোর্স উঠে যাওয়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের একটা গোষ্ঠী এই কলেজের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

● প্রশ্ন : আমাদের কলেজ সম্পর্কে আর কোনো ঘটনার কথা কি বলবেন?

● উত্তর : দেখ, ঘটনা তো কতই ঘটেছে। একটা ঘটনার কথা মাকেমাঝে আমার মনে পড়ে। সেটা বলি। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান দাবী করল যে বিভাগ-পূর্ব যুক্তবঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং শিবপুর বি-ই কলেজ, এই দুটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সুতরাং এ দুটির যা সম্পদ তার অর্ধেকটা পাকিস্তানের প্রাপ্য। অর্থাৎ লাইব্রেরীর বইপত্র, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অর্ধেকটা ওদের দিয়ে দিতে হবে। এটা অবশ্যই একটা হাস্যকর প্রস্তাব। অর্ধেকটা যন্ত্র বা বই নিয়ে ওদের কোনো লাভ হবে না, তবু ভারতের ফততা ক্ষতি করা যায়! এ বিষয়ে ওদের জনাব সুরাবর্দি এবং কুদরৎ-ই-খুদার সঙ্গে আমাদের অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার এবং শৈবালকুমার গুপ্তের কয়েকবার আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বই বা যন্ত্রপাতি দেওয়া যাবে না, তবে ল্যাবরেটরীর সবকিছু মূল্যায়ন করে তার অর্ধেক দাম ওদেরকে দেওয়া হবে। শিক্ষাসচিব স্বীরেন্দ্রমোহন সেন প্রেসিডেন্সি কলেজে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্যায়ন করার নির্দেশ জারি করলেন আমার

উপরে-সেই মূল্যায়ন করে দিতে হবে বারো দিনের মধ্যে । একশো বছরের পুরানো কলেজ । তার এতোগুলো বিভাগের সাজসরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতির মূল্য অল্প সময়ে নির্ধারণ করা এক দুরূহ কাজ । আমি কলেজে কনিষ্ঠ অধ্যাপকদের অন্যতম । আমার উপরে এ কাজের হুকুম কেন হল, জানি না । যাক, কাজ শুরু করলাম । অধ্যাপক সুরাজবন্ধু সান্যাল এবং সন্তোষকুমার রায় আর আমার তরুণ সহকর্মীরা আমাকে তখন প্রচুর সাহায্য করেছিলেন । মনে পড়ে, তখন কয়েকদিন রাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি । অনেক রাত পর্যন্ত স্টক-বই খেঁটে যন্ত্রপাতির লিস্ট ও দাম স্থির করতে হত । শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের কাছে আমার রিপোর্ট দাখিল করতে পেরেছিলাম । আমি যে মূল্যায়ন করেছিলাম, পাকিস্তানের দাবী ছিল তার দশগুণেরও বেশি । শুনছি অনেক তর্কবিতর্কের পরে আমার দেওয়া মূল্যায়ন দুগুণ গ্রহণ করেছিল । এরকম যে একটা দাবী হতে পারে, সেটাই তখন আশ্চর্য মনে হয়েছিল ।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত

সাক্ষাৎকারী :

আশিস দাশগুপ্ত*

● প্রশ্ন : ছয় দশকের বেশি সময় আপনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন — প্রথমে ছাত্র হিসেবে, পরে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকরূপে এবং অবসর গ্রহণের পরে অর্থনীতির ‘এমেরিটাস’ অধ্যাপক হিসাবে । আপনার এ কলেজের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কিছু জানতে আমরা আগ্রহী ।

● উত্তর : ১৯২৮ সালে অর্থনীতি অনার্সের ছাত্র হিসাবে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি এবং ১৯৩০ সালে স্নাতক ডিগ্রী পাই । এম. এ. ক্লাসে কলেজেরই ছাত্র থেকে যাই । হিন্দু কলেজ ও তার উত্তরসূরী সম্বন্ধে আমি গড়েছিলাম এবং জানতাম যে কলেজটির ইতিহাস গর্ব করার মতো । সারা পূর্ব ভারত থেকে ছাত্রেরা এই কলেজে আসতেন এবং এখানে যে শিক্ষকেরা পর পর পড়িয়ে যেতেন তাদের উৎকর্ষ ছিল বলবার মতো । আমি যখন কলেজে গিয়ে এলাম, ঠিক তখনই হীরেন মুখোপাধ্যায়, হুমায়ূন কবির ও পঞ্চানন চক্রবর্তী এই তিনজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র কলেজ ত্যাগ করে যাচ্ছেন । পরীক্ষায় অপরাজেয় নবগোপাল দাস এবং উত্তরকালে আমাদের সর্বোচ্চ স্তরের ঐতিহাসিকদের অন্যতম অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো

ছাত্রেরা ছিলেন আমার নিজের ক্লাসে । আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অর্থনীতিতে স্যার জাহাঙ্গীর কোয়াজী, ইতিহাসে কুরুভিলা জাখারিয়া এবং ইংরেজীতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ । সে সময়ে শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা খুব সহজ ছিল না, কিন্তু কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক হবার পরে আমি এঁদের অনেকের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম । এসব ছাড়া রবীন্দ্র পরিষদের মতো ছাত্রদের বিশেষ সংস্থাগুলিতেও আমাদের খুব আগ্রহ ছিল ।

আঠারো বছর বিরতির পরে ১৯৫০ সালে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক হয়ে আমি কলেজে ফিরে এলাম । দেখলাম, পুরানো প্রথাগুলি শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের আকৃষ্ট করছে । অর্থনীতি বিভাগে আমরা এবিষয়ে বিশেষ করে ভাগ্যবান ছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, তারা পড়তো হয় পদার্থবিদ্যা, না-হয় অর্থনীতি । কলেজে এক দশকের বেশি সময় অধ্যাপনাকালে আমি অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, যতীকুমার সেনগুপ্ত, মিহির রক্ষিত, অমিয়কুমার বাগচি, প্রণব বর্ধন, অমিত ভাদুড়ী এবং বিমল জালানের মতো ছাত্র পেয়েছিলাম । ক্লাসে এরকম উৎকৃষ্ট ছাত্রের উপস্থিতি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা দিত । আমরা চাইতাম যে আমাদের ছাত্রেরা কঠিন পরিশ্রম করুক এবং তাদের সঙ্গে আমাদেরও কঠিন পরিশ্রম করতে হত ।

আমি যে সবচেয়ে প্রকট পরিবর্তনটি দেখেছিলাম তা হল সহশিক্ষা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কলেজের সম্পূর্ণ ইতিহাসে একমাত্র ছাত্রী ছিলেন ১৮৯৭-৯৯ সালে — কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক পি.কে.রায়ের কন্যা চারুলতা রায় । ১৯৪৬ সালে ছাত্রীদের জন্য কলেজের দরজা খুলে দেওয়া হল । তাঁরা কেবল কলেজের শোভাই বাড়ালেন না, পরন্তু শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের নিদর্শন দিলেন । যেমন বছরগুলি কাটিতে লাগল, ইংরেজী, বাংলা, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার মতো কতকগুলি বিষয়ে ছাত্রীরা প্রাধান্য লাভ করলেন ।

বেকার ল্যাবরেটরী বাড়িটির নতুন বর্ধিত অংশে সম্পূর্ণ একপ্রস্থ ঘর পাওয়া অর্থনীতি বিভাগে আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাগ্যের কথা হয়েছিল । ১৯৫০-এ যখন আমি শিক্ষক হিসাবে এলাম, অর্থনীতি অনার্সের ক্লাসগুলি তখন প্রধানত মূল বাড়ির অন্ধকার ও স্নান বারো নম্বর ঘরেই অনুষ্ঠিত হত । নতুন জায়গায় এসে আমরা কেবল যে শিক্ষকদের জন্য ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠ এবং সুসজ্জিত শৌচাগারই পেলাম তা নয় ; মূল গ্রন্থাগার থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলিকেও আমরা নতুন বাড়িতে সরিয়ে আনতে পারলাম । প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগার সব সময়েই

* গ্রাজু ছাত্র ১৯৫২-৫৪ (অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

দেশের অন্যতম সমৃদ্ধতম গ্রন্থাগার ছিল ; কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণ ছিল লম্বজাজনক ।

শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল । যে কোনো সময়ে শিক্ষকের কাছে আসার স্বাধীনতা ছাত্রছাত্রীদের ছিল এবং তারা আমাদের বাসস্থানেও আসত । পাঠ্যসূচী ছাড়াও বিতর্কসভার মতো ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ স্থাপিত হত । বহু বছর আমি বিতর্কসভার সভাপতি ছিলাম ।

আমার ছাত্রজীবনে অনার্সে যে বিষয়টি ‘রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় দর্শন’ নামে পরিচিত ছিল, পরে তার নামটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ‘অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ । আরো পরে আমি যখন শিক্ষক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ হয়ে যায় । কিন্তু আমাদের পুরানো যোগাযোগ অব্যাহত থাকে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রধান হলেন অধ্যাপক ঘোষাল এবং আমরা একত্রে একই কক্ষমণ্ডলীতে কাজ করতে থাকলাম । আমি যখন ছাত্র ছিলাম, যুক্ত বিভাগে তিনজন শিক্ষক ছিলেন । আমি যখন শিক্ষক হয়ে ফিরে এলাম, তখন সংখ্যা ছিল চার । দুই বিভাগ স্বতন্ত্র হলে অধ্যাপকমণ্ডলীরও বিস্তার ঘটল । এখন একত্রে ধরলে দুই বিভাগে তেরোজন শিক্ষক আছেন ; এর উপরে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের প্রকল্পে নিযুক্ত গবেষণাকর্মীরা । বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ বিভাগগুলির তুলনায় এই দুই বিভাগ যৌথভাবে অনেক বেশি বলিষ্ঠ । তবু সরকার অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেউই কলেজকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে অনুমতি দেননি ।

আমি ১৯৬২ সালে রাইটার্স বিন্ডিং-এর একটি পদে যোগ দিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে যাই । প্রতি সপ্তাহে আমি অতিরিক্ত (supernumerary) শিক্ষক হিসাবে যাতে কয়েকটি ক্লাস নিতে পারি, সেরকম ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিলাম ; কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় নি । ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল কম বেশি সরকারী পর্যায়ে । প্রেসিডেন্সি কলেজ সফলকায় ফাইলগুলো আমার হাত দিয়ে যেত এবং আমি বহু জটিল সমস্যার অস্তিত্ব দেখতে পেতাম । আমি যখন ১৯৬৯ সালে সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে এই কলেজে ‘এমেরিটাস’ অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন । এমেরিটাস অধ্যাপকের পড়ানোর দায়িত্ব থাকে না । কিন্তু প্রথম তিন-চার বছর নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে আমি বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলাম । বিশেষ করে ১৯৭১ বা ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সম্বন্ধে

ছয়টি ভাষণ দেওয়ার কথা আমার মনে আছে ।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ এই কলেজে অতিরিক্ত অধ্যাপকমণ্ডলীসহ অর্থনীতি গবেষণার একটি কেন্দ্রের স্থাপনা অনুমোদন করলেন । আমাকে সভাপতি করে একটি উপদেষ্টা সমিতি নিযুক্ত হল । দুবছর আগে পর্যন্ত এ কেন্দ্রের আয়োজিত মোটামুটি সব সেমিনার এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের ভাষণেই আমি উপস্থিত থেকেছি, যতদিন, না বার্ষিকের শারীরিক অসামর্থ্যে আমার চলাফেরা সীমিত হয়ে পড়ল । আমি জানি, কেন্দ্রটির বহু সমস্যা রয়েছে । কিন্তু এখন আর আমি খুব কমই সাহায্য করতে পারি ।

এখনো স্বপ্নে দেখি আমার কলেজের ক্লাসরুমে রয়েছি । প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম তা অন্য কোথাও আমি পাই নি । কোথাও নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হলে কেবল উল্লেখ করি, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির এমেরিটাস অধ্যাপক । কলেজের বয়স এখন একশো পঁচাত্তর বছর । অর্থনীতি বিভাগের ইতিহাস তার চেয়ে কম দিনের — প্রায় আট দশক । যখন তাবি কয়েক বছর এই ইতিহাসের অংশভাক্ ছিলাম, অনেক আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি ।

[মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত]

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

সাক্ষাৎকারী :

শম্ভু ঘোষ *

● **প্রশ্ন :** অনেকদিনের অধ্যাপক জীবনে আপনাকে তো অনেক কলেজে পড়াতে হয়েছে, পড়াতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়েও । সব মিলিয়ে, শিক্ষাপরিবেশের কথা ভাবলে এখন কি আপনার মনে হয় যে এদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল ?

● **উত্তর :** নিশ্চয়ই ছিল । প্রথমতঃ এখানে মেধাবী তথা অভিজাত বংশের ছাত্রছাত্রীরাই পড়ার সুযোগ পেত, যে ধারা আজও বেশ কিছু পরিমাণে বহমান । তবে তারই মধ্যে বিশেষ কথা এই যে, বর্তমানে অনার্স পরীক্ষার মধ্যস্থতায় ছাত্রছাত্রী তর্তি হওয়ার কারণে অনভিজাত দরিদ্র পরিবারেরও বেশ কিছু শিক্ষার্থী কলেজে স্থান পায় । এরই সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে যে আগেকার দিনের আই-এ, বি-এ, আই-এস-সি, বি-এস-সি বিভাগ এখন আর নেই । কিছুকাল যাবৎ প্রেসিডেন্সি কলেজ গুরোপুরি অনার্স

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৪৭-৫১ (বাংলা)

কলেজ। তখন স্বাতন্ত্র্যের ভিন্ন দিকও পরিস্ফুট ছিল। সেটা অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণে। এখন আমরা গণতান্ত্রিকতার গৌরব করছি, ডিসিপ্লিনের দিকটায় কিছু কমতি হলেও উপেক্ষা করছি। তখন তা ছিল না। অধ্যাপকেরা কমিটি করছেন, ছাত্রেরা এমন কি ছাত্রীরাও সিঁড়ির ধাপে বসে সময় কাটাচ্ছে—এমনটা কল্লনাগীত ছিল। আমাদের আসার আগেকার পর্যায়ে তো বটেই, আমরা আসার দু-চার বৎসর পরেও এমন দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। তৃতীয়তঃ প্রেসিডেন্সির শিক্ষকেরা অন্যান্য কলেজের শিক্ষকদের চাইতে নিজেদের কিছু স্বতন্ত্রই বোধ করতেন, তবে তা উদ্ভাসিকতার পর্যায়ে পড়ত এতদূর মনে হয় না। সরকারি চাকরি, রাজকীয় কলেজ। তাঁদের এরকম অতিমানের পোষকতা প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপকেরাও করতেন। মোটের উপর কী শিক্ষক, কী ছাত্র, ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সারস্বত চেতনা কলেজটিকে ‘পাস-করানোর মাধ্যমে’র উপরেই স্থান দিত। বিভিন্ন কারণে, আর্থিক কারণও যার মধ্যে পড়ে, প্রাইভেট কলেজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম-করা অধ্যাপক থাকলেও এতদূর সারস্বত বোধ ছিল না। কী বিজ্ঞান, কী কলাবিদ্যা, প্রেসিডেন্সি আজও সেই ট্র্যাডিশন তুলনামূলকভাবে কতকটা উন্নত আকারেই বহন করে চলেছে বলতে হবে। অবশ্য নেমেছে সর্বত্রই, কিন্তু তবু প্রেসিডেন্সির একটা চারিত্র্য আজও থেকে গেছে মনে করি। আর, সীমিত কিছু ছাত্র-ছাত্রী সালোয়ার পাঞ্জাবি পরলেও, কি সিগারেট ফুঁকলেও তাতে সামগ্রিক ক্ষতি হচ্ছে এমন মনে করা যায় না। সেই ইয়ং বেঙ্গলের অন্তঃসার এখন আর নেই। বয়স-অনুসারে পরা একটা খোলস যদি নজরে পড়ে—কী বা আসে যায় ?

● **প্রশ্ন :** ছাত্রবয়সে (১৯৪৭-৫১) আমরা দেখতাম প্রত্যেক বিভাগের মাস্টারমশাইদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর না থাকলেও স্বতন্ত্র টেবিল বা স্বতন্ত্র কোণ বরাদ্দ করা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের মাস্টারমশাইদের মধ্যে চিন্তাভাবনা বা হাসিখিট্টা বিনিময়ের কোনো সহজ পথ কি ছিল তখন ? সে-পথে কি বাড়তি একটা মনীষাচর্চার আবহাওয়া তৈরি হতে পারত ?

● **উত্তর :** নোতুন ধরণের প্রশ্ন এবং কৌতুককরও বটে। প্রেসিডেন্সিতে প্রায় প্রত্যেক অধ্যাপকেরই স্বতন্ত্র একটা করে সজ্জিত টেবিল থাকায় Professors' Common Room বলতে যা বোঝায় ঠিক তা ছিল না। তবে গোটা দশেক লাউন্জিং চেয়ারযুক্ত বিশ্রামকক্ষ ছিল। মধ্যখানে পত্রপত্রিকাবাহী একটা গোল টেবিল ছিল। এ জায়গাও আছে এবং এটিকে প্রকারান্তরে কমনরুমও মনে করা যেতে পারে। আমাদের সময়ে ঐ ঘরের লাউন্জিং চেয়ারে মাঝে মাঝে অবসর সময়ে আশ্রয় নিতেন জনার্দনবাবু,

দর্শনের গোপীনাথ বাবু, ইংরেজির সোমনাথ মৈত্র মশায়, অঙ্কের অধ্যাপক প্রভৃতি কেউ কেউ। এরই মধ্যে গল্পগুজব, হাসি-তামাসা অবশ্যই চলত, কিন্তু আগাগোড়া তেমন কিছু নয়। জনার্দনবাবু, সোমনাথবাবু গল্প-রসিকতা করতেন, তাঁদের আগেকার দিনের কারো কারো চারিত্র্য নিয়ে রসরসিকতাও বাদ যেত না। কিন্তু অনেকে আবার নেহাৎ প্রয়োজনে না পড়লে লাউন্জিং আশ্রয় করতেনও না। সুশান্তন সরকার মশায়কে দেখা যেত বিশ্রামকক্ষের উত্তর-দক্ষিণ ধরে কেবল পায়চারি করতে। লম্বা মানুষটি বড় বড় পা ফেলে কেবল পায়চারি করতেন, তাঁর ঐ ছবিটিই বোধ হয় সকলের মনে আজও গেঁথে আছে। ইংরেজির তারাপদবাবু সদালাপী হলেও নিজের টেবিল ছেড়ে বিশেষ কোথাও নড়তেন না, আর পড়ানোর অংশগুলি পুনঃপুনঃ ভালো করে দেখে নিতে ছাড়তেন না। কমনরুমে বসে অধ্যাপকদের আড্ডাবাজি, অন্যের সম্পর্কে আলোচনায় হো-হো হাসি, এমনটা প্রেসিডেন্সিতে দেখা যায় নি। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, অধ্যাপকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত নিয়ে চায়ের টেবিল পর্যন্তও শালীনতায়ুক্ত দূরত্বই কামনা করতেন, তাছাড়া কাজেও ব্যস্ত থাকতেন। আর ঐ লাউন্জিং-এর ঘরটা অবশ্য বহিরাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথোপকথনের জায়গাও ছিল, কারণ সে সুবিধা একটি টেবিল একটি চেয়ারযুক্ত নিম্ন নিম্ন বসার জায়গায় মিলতও না। লাউন্জিং-এ মাঝে-মধ্যে মনীষাচর্চার আবহাওয়াও দেখা যেত না, এমন নয়। দেখতাম, সুবোধ সেনগুপ্ত মশায় দর্শনের গোপীনাথবাবুর কাছ থেকে আনন্দবর্ধনে ব্যবহৃত নৈয়ায়িক অর্থজরতী, অর্থ-কুকুটী প্রভৃতি উপমাপ্রয়োগগুলি বুঝে নিচ্ছেন। ইয়োরোপের ইতিহাস বিষয়ে নবমনীষার অধিকারী সুশোভনবাবুর কাছে আমিও কুচিৎ সারস্বত প্রশ্ন তুলতাম। একদিন তাঁকে বিপদে ফেললাম ঐ প্রশ্ন করে — অ্যাসেমব্লিতে বামপন্থীরাও যে ভারত-বিভাগের সপক্ষে ভোট দিলেন, এটা কেমন হল ? কোথাও বসতেন না তিনি, পা-চালানোর মধ্যেই তাঁর ভাবনাচিন্তার স্ক্রুণ হত। মনে আছে, একটা স্ট্রাইকের দিন সুশোভনবাবু ল্যান্সডাউন ধরে হেঁটেই কলেজে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্সির আবহাওয়া একেবারে গভীর ও পারস্পরিক কাটা-কাটা, ছাড়া-ছাড়া মনে হয়েছিল গোড়ার দিকে। আরও একটা কথা, “অধ্যাপক” স্তরে উন্নীত কিছু ব্যক্তি নবাগত লেকচারারদের একটু কৃপার চোখেই দেখতেন যেন। সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষকদের মধ্যে নিকট-বন্ধুতার পরিবেশ কোনোকালেই গড়ে ওঠেনি। ‘কাজের জায়গায় কেবল কাজ, কেবল কাজেরই কথা’ — এরকম একটা সাহেবি ডিসিপ্লিনের ট্র্যাডিশনই বোধ হয় প্রেসিডেন্সির অধ্যাপককুলের মধ্যে বাঙালী সৌহার্দ্য জন্মানোতে বাধা দিয়েছে।

● প্রশ্ন : ১৯৫০-৫১ সালে অনার্স পড়বার সময়ে আমাদের মনে হত যে বিভাগের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো পাঠসমস্যা বা এমনকি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারি। সম্রমের বোধের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার বোধও তৈরি হতো খানিকটা। সেটা কি ঐ দু-তিন বছরের কোনো ব্যতিক্রমের ইতিহাস, নাকি এটাই ছিল কলেজের স্বাভাবিক ধরণ ?

● উত্তর : না। এরকম অধ্যাপক-ছাত্র মর্মস্পর্শী গভীর সম্বন্ধ-বন্ধন একটা ব্যতিক্রম। এটা বাংলা বিভাগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 'অনুরাগ' বন্ধনের হোতা ছিলেন জনার্দনবাবু, কালীপদবাবু (কালীপদ সেন), দেবীবাবু (দেবীপদ ভট্টাচার্য) ও আমি। জনার্দনবাবু চট্টগ্রাম কলেজে থাকার সময় সেখানকার মুসলিম ছাত্রদের যত্নে ও শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগে কিতাবে সিক্ত হয়েছিলেন তার কাহিনী শোনাতে। জনার্দনবাবু তো একদিন পড়ানোর প্রারম্ভেই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন - "মা সুরতি, তোমার হাত দুখানি শূন্য কেন মা?" দেবীবাবু ছাত্রছাত্রীদের সাংসারিক খবরাখবরও রাখতেন। অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক-ছাত্রদের মধ্যে এ মনোভাবের বিস্তার আমি দেখিনি বললেই চলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ক্লাসের বাইরে, বারান্দায় বা অধ্যাপক-কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে কুষ্ঠাবোধ করতেন।

● প্রশ্ন : ছাত্ররাজনীতি বা ব্যাপকার্থে দেশীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ কলেজপ্রাঙ্গনে কতটা লক্ষ্য করেছেন তখন? সেই রাজনীতি কি শিক্ষাপরিবেশের পক্ষে সহায়ক ছিল, না কি কোনোরকম বাধাই সৃষ্টি করত?

● উত্তর : হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি বৈকি। স্বাধীনতা পাওয়ার দু বছর আগে আমি প্রেসিডেন্সিতে ঢুকি। তখনও স্বাদেশিক আন্দোলনের রেশ মিলায় নি। তাছাড়া মাঝে মাঝে নানান ব্যাপারে ছাত্রদের প্রতিবাদী আন্দোলন এবং স্ট্রাইক পালন করতে হতই। তবে তা ব্যাপক কিছু ছিল না এবং কলেজীয় সারস্বত ব্যাপারকে আহতও করত না। আমরাও শূন্য কক্ষ দেখে এসে টেবিলের চারদিকে বসে গল্প জুড়তাম। পরের দিনই আবার যথারীতি ক্লাস চলত। নকশাল আন্দোলনের সময় (সনৎ বাবু অধ্যক্ষ) আমি মৌলানা আজাদে কাজ করছি। সেখানেও এর ব্যাপ্তি ছিল। তবে প্রবল ছিল না। আজ এখন বলতে বাধা নেই, আমরা কেউ কেউ আন্দোলনের সমর্থকও ছিলাম। আন্দোলনকারী ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক অঙ্গুষ্টই ছিল।

● প্রশ্ন : ছাত্রছাত্রীদের নানারকম দুষ্কৃমির মুখোমুখি হতেই হয় নানাসময়ে। সেই ব্যাপারে কি এ-কলেজের

ছেলেমেয়েরা কোনো ব্যতিক্রম ছিল?

● উত্তর : নাঃ, ব্যতিক্রম ছিল না। একত্র থাকা অবস্থায় দুষ্কৃমির দিকে কারো কারো মন যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ছাত্রাবস্থায় ক্লাসে তা আমরাও তো করেছি। তবে এটা ঠিক যে প্রবীন অধ্যাপকদের ক্লাসে এটা তারা কখনোই করত না। করত নবাগত অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে। আর অধিকাংশই অনার্সের ছাত্র হওয়ায় পাস ক্লাসে তাদের মনোযোগ দেওয়ায় প্রয়োজনই ছিল না। আমাদের প্রথম প্রথম ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্রদের হৈ-ঠৈ দুষ্কৃমির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একে পাস বাংলা, তাতে ফোর্থ ইয়ারের পাস ছেলের দল, আর নোতুন নোতুন আমার পড়ানোতেও একটু দ্বিধাসংকোচ নিশ্চয়ই ছিল - তারা তার সদ্যবহার করলে নিজ ছাত্রাবস্থার কথা স্মরণ করে তাদের আন্তরিকভাবে দোষ দিইনি কখনও। কিন্তু সে ঐ একটা বর্ষে। থার্ড ইয়ারে তা হয়নি। এবং পরেও কখনো না।

● প্রশ্ন : আপনি যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়িয়েছেন, তখনকার দিনের শিক্ষণের মান অথবা শিক্ষার্থীদের মান যে-রকম ছিল, পরবর্তী কালে তার কোনো উন্নতি বা কোনো চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে কি মনে করেন?

● উত্তর : হ্যাঁ, একটু পরিবর্তন হয়েছে বৈ কি। মান একটু নেমে গেছে। বিশেষ বাঙলাতে। কারণ, কৃতী ছাত্রেরা কেউই এখন বাঙলা পড়তু আসে না। কী ডিগ্রি কলেজে, কী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার উপর কালের গতিতে অধ্যাপকেরাও কি আর ততোটা এবং তেমনি আছেন? আরও একটা আপদ হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ। যদিচ দ্বিধা সহকারেই একথা বলতে হচ্ছে, তবু এটা দিবালাকের মতই সত্য। তবে অন্যান্য ডিগ্রি কলেজের তুলনায় প্রেসিডেন্সিতে রাজনীতির হাওয়ার পরিমাণ কম-এই যা। আমার মনে হয়, স্বাধীনতা পেয়ে যাওয়ার পর দেশকে নোতুন করে গড়ে তোলার অধ্যায়ে সারস্বত ক্ষেত্রে কড়া নিয়মনিষ্ঠার প্রচলন ঘটাতে পারলে, শিক্ষকদেরও পুরোপুরি নীতিনিষ্ঠ করে তুলতে পারলে উপকার পাওয়া যাবে।

● প্রশ্ন : আপনার চিন্তাভাবনাকে উশকে দিতে পেরেছেন বা তার সহায়ক হয়েছেন, এমন-কোনো সহকর্মী অধ্যাপক বা শিক্ষার্থী ছাত্রের কথা কি কখনো আপনার মনে পড়ে? নিজের বিভাগে বা নিজের বিভাগের বাইরে?

● উত্তর : আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের আদর্শের প্রভাব কিছু পরিমাণে আমার উপর বর্তেছে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার অগ্রজ-অনুজ সম্পর্ক

স্থাপিত হয়েছিল। আর অভিজ্ঞতা সহকারে দেখলাম, উপযুক্ত ছাত্ররা শিক্ষকদের উৎকর্ষের সহায়ক হয়ে থাকে। আমার সৌভাগ্যক্রমে শংকরীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, শিশির দাস, মানস মজুমদার প্রমুখ ভালো ছাত্রদের পেয়েছিলাম। তাদের জানবার কৌতূহলের সঙ্গে আমাকেও তৈরি হয়ে নিতে হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, বলতে গেলে একটা হীন অহংকার ছিল যে বাঙালয় আমি প্রায় সবজ্ঞাত। এর ফলে ক্লাসে পড়ানোর আগে আমি বিশেষ তৈরি হয়ে যেতাম না। একটি ছাত্র আমার সে অহংকার একদিন চূর্ণ করলে। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে প্রথম চৌধুরীর একটা প্রবন্ধ পড়াচ্ছি - তাতে 'কাক' আর 'কলবিক্লেব' বিপরীত তুলনা ছিল। কলবিক্লেব মানে আমি জানতাম না। পড়াতে পড়াতে ধরেই নিলাম যে ওটা ময়ুর হবে। একটি ছাত্র সে ভুল ভেঙে দিলে - ছাত্রটির নাম নিত্যপ্রিয় ঘোষ, শঙ্খ ঘোষের অনুজ। আজও সে কথা আমার মনে আছে। তা-ই জানালাম।

● প্রশ্ন : সম্প্রতি প্রায় দশ বছর ধরে এই কলেজেরই একতলার একটি ঘরে আপনি অভিধান সংকলনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কলেজের সঙ্গে অন্য কোনো যোগ না থাকলেও, এই নিরন্তর নিকট-সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কি মনে হয় যে সে-আমল থেকে এ-আমলের বইয়ের পরিবেশে লক্ষণীয় কোনো বদল ঘটেছে?

● উত্তর : আগেও বলেছি, এখনও জানাচ্ছি, পরিবেশের বেশ একটুখানি বদল ঘটেছে বৈকি। আমাদের পড়ানোর সময়েই আগেকার ডিসিপ্লিন ফ্রীম্যান। এখন মাত্র আরও বেশি। সীমিত হলেও সালোয়ার-পাঞ্জাবি বা প্যান্ট-হাওয়াই পরা কেউ কেউ সিগারেট টানছে, দলে দলে ক্যান্টিনে যাচ্ছে আর আসছে - এসব দৃশ্য আগে ছিল না। তার উপর দেখতে হবে যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও এখন প্রচুর বেড়েছে। তবে হৈ-হল্লাটা এবং বেশবাসের ভঙ্গিমাটা একতলাতেই সীমিত। দোতলা-তেতলায় এটা দেখা যায় না। বিজ্ঞানের ক্লাসে তো একেবারেই না। সুতরাং এরকম যা-খুশী-তাই ব্যাপারে শিক্ষায় আত্যন্তরীণ ব্যাপার দূষিত হচ্ছে এমন মনে হয় না। স্পর্শ লাগলেও তা এখনও বহিঃস্থই রয়েছে এবং তার পরিমাণও সীমিত। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন মেলামেশার বিরোধীও নই। তবে সীমা লঙ্ঘিত না হলেই হল, আর এসব বহিঃস্থে রেখে লেখাপড়ার দিকে একটা চোখ অতদূর রাখলেই হল। তা বোধ করি তাদের আছে। হাসিস্থূপান করে লোহার সিঁড়িটায় বসে ঝিমোচ্ছে, এমন স্বতন্ত্র দৃশ্য দশ বছরে দুটো-একটা মাত্র চোখে পড়েছে।

● প্রশ্ন : প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্যের কথা ভেবে আপনার কি মনে হয় যে এখানকার অধ্যাপক নিয়োগে বা

ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে কোনো স্বতন্ত্র মান থাকা উচিত?

● উত্তর : যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে একটা মান রাখা প্রয়োজন। দুঃসহ বেকারির চাপে সেটা সম্ভব হচ্ছে না ঠিক, তবু এটাই নীতি। উচ্চশিক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রাচীন ভারতে অতিমাত্রায় সংকুচিত ছিল, সে না-হয় খারাপ। বিদেশে নানা কারণে উচ্চশিক্ষায় অনেকে আপনা থেকেই যেতে চায় না। তার আগেই ব্যবসায়িক শিক্ষায় বা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে। পোড়া স্বদেশেই বর্তমানে এর ব্যতিক্রম। পোস্ট-গ্রাজুয়েটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওর অর্থেকের উপর ছাত্রছাত্রীই যোগ্য শিক্ষার্থী নয়। সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। ফলে শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড অবনত হচ্ছে এবং আরও হবে এবং কী শিক্ষাক্ষেত্রে কী প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত হয়ে এসেছে। কলেজগুলির বাজার-পরিবেশ এবং পরীক্ষা পাসের উদ্যোগ আয়োজন দেখে আমাদের এমনও মনে হয়েছে যে ব্যাংকের মত এগুলিরও ইণ্ডাস্ট্রি তালিকায় নাম ওঠা উচিত। এও তো পণ্য উৎপাদনের মত ব্যাপারেই দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্সির পক্ষে অবশ্য একটা রক্ষাকবচ আছে, সে কথা বলছি বাহুল্য।

● প্রশ্ন : প্রায়ই শোনা যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজকে একটা স্বয়ংশাসনের ভূমিকায় নিয়ে আসা সংগত। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি মনে হয় যে সে রকম করলে আমাদের চলতি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এখানে এক ধরণের উন্নততর শিক্ষণ সম্ভব হবে?

● উত্তর : হ্যাঁ। প্রেসিডেন্সির যা পরিস্থিতি বা সংস্কৃত কলেজের যা, তাতে এগুলিকে স্বাধীন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সগোত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা খুবই সংগত মনে করা যায়। সেরকম অধিকার পেলে এগুলি ক্রমে নিজ মর্যাদা রক্ষার পূর্বাঙ্গ অকারী হবে এমনও আশা করা যায়। অধিকার না পেলে ও না দিলে পূর্বাহ্নে তা প্রমাণিত হয় কী করে? আমার তো মনে হয়, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত মান নির্ধারণের বাস্তব অধিকার তো স্কুল-কলেজগুলিরই থাকা উচিত। দু-এক বছর একটা বিশ্ব্যালার মধ্যে কেটে ক্রমশ তা যথাযথ রূপ নেবে, এমনটাই মনে করা যায়। আর পরীক্ষার যে অবস্থা চলছে, সেটা তো আদর্শের কাছাকাছিও যায় না। স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বছরের পর বছর পড়িয়ে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা-ই তো সঠিক। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখে পরে তা উঠিয়ে নেওয়া চলতে পারে।

যাই হোক, প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে এখনও প্রশিক্ষণ ও

পরীক্ষণে যে আদর্শ প্রতিপালিত হয় তাতে একে স্বাধীন সত্তায় ভূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এবং তা যত দ্রুত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকারী :

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় *

● প্রশ্ন : আপনি ছাত্র হিসাবে কবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেছিলেন ?

● উত্তর : ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে শারীরবিদ্যায় অনার্সসহ বি.এস-সি. পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে আমি সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগে আসি। ঐ পরীক্ষায় আমি শারীরবিদ্যা অনার্সের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করি। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) থেকে এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ১৯৩৫ সালে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে শারীরবিদ্যার স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে মাসিক বারো টাকা বৃত্তি দেয়। শারীরবিদ্যায় এম.এস-সি. পরীক্ষায় ১৯৩৭ সালে আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হই।

● প্রশ্ন : ছাত্রজীবনে কোন কোন অধ্যাপক আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ?

● উত্তর : আমাদের সময়ে শারীরবিদ্যার স্নাতকোত্তর বিভাগ কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক ডঃ বিজলীবিহারী সরকার এবং অধ্যাপক পরিমলবিকাশ সেন আমাদের পড়াতে। ডঃ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে বসতেন আর পরিমলবিকাশ সেন বিজ্ঞান কলেজে আমাদের ক্লাস নিতেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের সাম্প্রদায়িক প্রধান ছিলেন। ঐ তিনজন অধ্যাপক আমাদের বিশেষ যত্ন নিয়ে পড়াতে। বায়োকেমিস্ট্রি পড়াতে পরিমলবিকাশ সেন। তিনি আমাদের পুত্রবৎ দেখতেন এবং আমাকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অধ্যাপক মহলানবিশের বক্তৃতার তুলনা ছিল না। তিনি ইংরেজী বলতেন চমৎকার। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ভাষায় তিনি আমাদের দুরূহ বিষয় বোঝাতেন।

● প্রশ্ন : প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনার সময়ে স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যার ক্লাসের সুবিধা-অসুবিধা কেমন

ছিল ?

● উত্তর : আমাদের আলাদা স্নাতকোত্তর প্রাকটিক্যাল ক্লাসের ল্যাবরেটরী ছিল না। আমরা স্নাতক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরীতেই ক্লাস করতাম। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের মধ্যেই অনেক সময়ে স্নাতক শ্রেণীর ক্লাসের জন্যে আমাদের ক্লাস ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হত। স্নাতক বিভাগের শিক্ষকদের কাছে অনুযোগ-অভিযোগ করে কোনো ফল হত না।

● প্রশ্ন : তখনকার তুলনায় আজকের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন বলে আপনার মনে হয় ?

● উত্তর : আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ছিলাম, তখন শিক্ষকদের ভয় পেতাম। তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশতেন না। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকত। আমার এ অবস্থা ভাল লাগত না। যখন অধ্যাপক হয়ে এই বিভাগে এলাম, ছাত্রাবস্থার অসুবিধার কথা আমার মনে ছিল। সেসব সমস্যা আমি দূর করবার চেষ্টা করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব কমিয়ে এনেছিলাম। তাদের সঙ্গে একত্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পুনর্মিলন উৎসবের প্রবর্তন, ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় বিভাগের প্রাচীরগু 'প্রাচীরিকা'র প্রকাশ, পুনর্মিলন উপলক্ষে ছাত্রশিক্ষক মিলিত অভিনয়, সঙ্গীতের আসর, খেলাধুলা প্রভৃতি এই ব্যবধানকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। আমার ছাত্রজীবনে এসবের অস্তিত্ব ছিল না। আশার কথা, ঐ সব ধারা বর্তমান শিক্ষকেরা অব্যাহত রেখেছেন।

● প্রশ্ন : আপনি অধ্যাপক হিসাবে কবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিয়েছিলেন ?

● উত্তর : আমি ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে (West Bengal Senior Education Service) যোগদান করি এবং ঐ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের স্থলাভিষিক্ত হই — এর অন্তর্বর্তী সময়ে আমার পূর্ববর্তী অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও নরেন্দ্রমোহন বসু সাময়িকভাবে বিভাগীয় প্রধানের কাজ করেছিলেন। আমার কাজে যোগদানের সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ।

● প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপনি দেশবিদেশে খ্যাত। সেই গবেষণার প্রেরণা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?

● উত্তর : ১৯২৭ সালে আমি যখন কলকাতার পিটি

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৪৪-৪৮ (শারীরবিদ্যা)

কলেজে আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হই, তখন আমার মামা নির্মালাপদ চট্টোপাধ্যায় এম.এস-সি. পাশ করে আমাদের সঙ্গে থেকে অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে বিজ্ঞান কলেজে রসায়নে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। আমার মামা ও আমি একই ঘরে এবং একই শয়্যায় দ্বিভাষিকতা করতাম। তাঁর কাছ থেকেই আমি প্রথম গবেষণার অনুপ্রেরণা পাই। আমার ইচ্ছা ছিল রসায়নে গবেষণা করার। পিতার নির্দেশে ডাক্তারী পড়তে বাধ্য হলেও গবেষণার ইচ্ছা আমার রয়ে যায়। ১৯৩৩ সালে আমি যখন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের লিটারারি সেক্রেটারি, সে সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহের পুষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং ডঃ গুহকে আমাদের কলেজে পুষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানাই। সেই বক্তৃতা আমাকে পুষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় আকৃষ্ট করে। এম.এস-সি. পরীক্ষায় বায়োকেমিস্ট্রি পেপারে ডঃ গুহ আমাদের পরীক্ষক ছিলেন এবং আমি ঐ পেপারে শতকরা ৯২ নম্বর পাওয়ায় তিনি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৭ সালে এম.এস-সি. পাশ করে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে ডঃ গুহের ল্যাবরেটরীতে ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গবেষণার কাজে যোগ দিই। তিনিই আমার গবেষণার মুখ্য প্রেরণা ও গুরু।

● প্রশ্ন : বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনি কি রকম সুবিধা-অসুবিধা পেয়েছিলেন ?

● উত্তর : বিভাগীয় প্রধান হিসাবে গবেষণার নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণে আমার কোনো বাধা ছিল না। স্থান, যন্ত্রপাতি ও অর্থের অসুবিধা ছিল। স্থানাভাব মেটানোর জন্য বিভাগের অব্যবহৃত ও ব্যবহৃত স্থানের পুনর্বিন্যাস করে আমায় কাজ করতে হয়েছিল—দুঃখের বিষয়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এই বিভাগ আর এক ইঞ্চিও স্থান পায় নি এবং এর আশু প্রতিকার খুবই প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ স্নেহময় দত্ত আমাকে এককালীন ৬০,০০০ টাকা অনুদানের এবং মাসিক ২০০ টাকা বেতনে একজন রিসার্চ ট্রেনিং স্কলার নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেন। অর্থাভাব মেটানোর জন্যে CSIR, ICMR, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি, গ্যাপট্যাকোস-ব্রেট নামে ভেষজ প্রতিষ্ঠান, লেডি টাটা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

● প্রশ্ন : স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠকালে গবেষণা করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কী ? এবিষয়ে সরকারের কি কোনো কর্তব্য আছে ?

● উত্তর : স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠের অঙ্গ হিসাবে গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। ছাত্রাবস্থায় গবেষণা আরম্ভ করলে গবেষণা করার মানসিকতা ও চিন্তাভাবনা ঠিকমতো শুরু হয়, ফলে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরে গবেষণা করার কাজে বহু সুবিধা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অনেক ছাত্র এই সুযোগ নিয়েছিল—তখন এম.এস-সি. পরীক্ষায় একটি স্পেশাল পেপারের পরিবর্তে গবেষণাপত্র পেশ করার নিয়ম ছিল। সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে সব ছাত্রছাত্রী এভাবে গবেষণা শুরু করে পরে দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে সুখময় লাহিড়ী, রাজর্ষি মজুমদার, ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণসুখা রোহাটগী প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যায়। পরে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। আমার মতে এটা retrograde step হয়েছিল।

প্রত্যেক শিক্ষকের গবেষক হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সুশিক্ষক হবার উপযোগী হবে না। সরকারের উচিত লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ গবেষকদের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা এবং প্রত্যেক শিক্ষককে গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মত প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকদের গবেষকদের সঙ্গে থেকে নিজ হাতে কাজ করা উচিত। তবেই গবেষকরা অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমি মনে করি। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও গবেষকদের মধ্যে গবেষণার পরিবেশ ও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। সরকারকে কলেজের গবেষণার জন্য স্থান, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যবস্থা এবং আর্থিক অনুদান দিতে হবে। কলেজে শিক্ষক ও গবেষককর্মীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার সৃষ্টি করতে হবে — যাকে নেহরু বলতেন scientific temper।

● প্রশ্ন : প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনার কাজের সময়ে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা কি আপনার মনে আসে ?

● উত্তর : ১৯৫২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনটির সমারোহ সকল সদস্য বিজ্ঞানীদের প্রশংসা অর্জন করে। আজও অনেকের মুখে শুনি, এরকম বিজ্ঞান কংগ্রেস আর কখনও হয়নি। ঐ অধিবেশনে শারীরবিদ্যা শাখার আমি সভাপতি ছিলাম।

১৯৫৩ সালে আর্জেন্টিনার নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ বের্নার্দো ওউসসাই (Houssay) বিনা আমন্ত্রণেই আমাদের বিভাগ দেখতে আসেন এবং আমার অনুরোধে ছাত্রছাত্রীদের একটি সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ভারতে এসেছিলেন ; বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত অ্যালোক্সান-প্রসূত মধুমেহ (alloxan diabetes) সম্বন্ধে আমার গবেষণার খবর জানা থাকায় তিনি সেই সূত্রে এই বিভাগের গবেষণাগার দেখতে এসেছিলেন ।

ঐ বছরেই ডঃ জে. বি. এস. হলডেন প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী হিসাবে এসে ‘ট্রিপটোফ্যান থেকে নিকোটিনিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ’ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন । আমার ব্যক্তিগতভাবে গর্ব ও আনন্দ যে বক্তৃতার পরে এই বিশ্ববিদ্যুত বিজ্ঞানী আমার কক্ষে এসে আমার স্বহস্তে তৈরি কফি পান করতে করতে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ আলাপচারী হয়েছিলেন ।

আর একটি ঘটনা, বোধ হয় ১৯৫৭ সালে হিন্দু হোস্টেলের জনৈক আবাসিক ছাত্র রাত্রি নটায় প্যারিচরণ সরকার স্ট্রীটে এক পুলিশ সার্জেন্টের দ্বারা প্রহৃত হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের দাবীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে । ছাত্রবিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে পূজার ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ।

Prof. Subodh Chandra Sengupta

Interviewer :

Tapati Gupta*

● Q : When did you join Presidency College as a student ?

● A : I came from the matriculation exam. I won a scholarship. That was in 1920; I was a Presidency student right up to 1926.

● Q : There must have been many British professors at that time ?

● A : Quite a few. But there came about a change in the structure of the Education Department. It came under the jurisdiction of a ministry supervised by an elected minister. After this, many of the British professors began to take early retirement and move homeward. The last recruit to the Indian

Education Service was in 1919.

● Q : I believe the Principal used to be an Englishman ?

● A : Yes, always. I also remember the Professor and Head of the Physics department was English, one E. P. Harrison. But he too retired soon and Professor P. C. Mahalanobis stepped into his shoes.

● Q : There must have been Englishmen in the —

● A : English Department ? Right. There were Professors Stirling and Holme. The former, quite a happy-go-lucky type, had himself photographed with the students before he left, and I heard that he could identify each student from the group photograph. From England, he used to send his contribution to the Students' Aid Fund. He even bequeathed some of his property to the college. He was a bachelor.

● Q : He must have been an interesting person !

● A : A jolly good chap. He took everything lightly. He was also the Bursar.

● Q : Was he a good teacher ?

● A : Well, he took only the I.A. classes because he was a paper-setter for B.A. Such were the norms. He used to say that pronunciation indicated one's place of origin.

● Q : And Mr. Holme ?

● A : A very good teacher with an academic approach. He was editor of the Arden edition of *As You Like It*. He had rigid notions about prose style. “Use no extra adjective, and if you use “very” before an adjective, I'd fine you Re.1/- for every such use”, he used to say. Difficult advice for us ! Wasn't ornamentation the soul of style ? Mr. Holme was always careful to define the terms he used : Romanticism, Renaissance — the latter to him was the “apotheosis of man” — I have found no better definition than this. He

*Alumnus 1964-67 (English)

taught us the Special Paper in B. A. and the Romantic period in M. A. Romantic poetry he defined by quoting Keats' famous lines :

"Charmed magic casements, opening on the foam

Of perilous seas, in faery lands forlorn"

● **Q** : What was the nature of the student-teacher relationship ? Were the Englishmen intimate with students as, for instance, Derozio had been?

● **A** : No — on the contrary, perhaps it was due to the presence of these Englishmen that there was a barrier between the students and teachers. A chit had to be sent in order to enter the professors' common room.

● **Q** : It is so different today — the place now looks like a common room for students.

● **A** : I, however, had a certain privilege in the fourth year class. I was then Editor of the college magazine and Professor Srikumar Banerjee was Editor-in-chief....Students watched my sorties to and from the staff-room with awe.

● **Q** : There must have been tutorial classes in which —

● **A** : There was more scope for student and teacher to come intellectually closer to each other. You still have such sessions in college today especially in our English department. This was and still is possible because of the small student-teacher ratio.

● **Q** : Do you remember any interesting tutorial episode?

● **A** : Ten to eleven a.m. was the allotted hour for four students who did tutorials with Mr. Holme. He would devote the first half hour to two of them while the other two would come at eleven. One of them I heard had written the phrase "destroyed the life of many people," whereupon he got a sharp nudge of the pencil from Holme who growled, "And why not the simple Teutonic word "killed"?"

● **Q** : Though during the last year I've noticed an element of seriousness on the part of many students and teachers regarding the pass subjects, they were quite neglected in my time....

● **A** : So too when I was a student, but then it was primarily students who were the shirkers. The exception was Professor P. C. Ghosh's English classes. Then there used to be a scramble for the front benches.

● **Q** : What pass subjects did you read, sir ?

● **A** : Economics and History. But I usually studied these subjects just before the exams.

● **Q** : And what was your impression of these classes ?

● **A** : Well, of the three teachers who taught us Economics, two would just dictate notes which the students did not even bother to take down. Sir Jahangir Coyajee was a distinguished teacher of Economics. He was knighted while still in service whereas J. C. Bose and P. C. Roy were knighted after retirement. Coyajee streamlined the teaching of Economics in Presidency.

● **Q** : Did you attend his classes ?

● **A** : Yes, though it was actually like non-attendance. He taught us in the fourth year class. The classes were comprised of both honours and pass students (that is, combined classes). The Honours fellows naturally sat in front. What ensued was conversation between Coyajee and his Honours students of which we back-benchers followed not a word. In fact without a grasp on the subject it was impossible for anyone to follow.

Coyajee a man of multiple scholarship was a good scholar of Persian, had record marks in History at Bombay University, a first class Tripos degree of Cambridge.

● **Q** : Ah yes ! Gone are the days of non-

specialisation and liberal scholarship. I believe Coyajee also became Principal ?

● **A** : He was so, for a time. In those days special consideration was shown to sons of the founders of the Hindu College at the time of admission. One gentleman, claiming the privilege for his son, said he had donated the tower clock. "But", said the Principal, "despite his legitimate rights, your son has passed in the second division. Make him appear again and get a first division".

Coyajee introduced a few administrative reforms : admission on the basis of marks, waiver of the custom of granting special concessions to Muslim candidates, and doing away with the Madrassah in the college. Even wards of V.I.Ps had to produce a respectable marksheet.

● **Q** : How did it feel to be a teacher at Presidency?

● **A** : The story behind my appointment is interesting. It shows how different were those days. Mine was the last appointment to be recommended by the governing body; after that the Public Service Commission took over such things. I came to know later that there was a heated debate between the Principal and the D.P.I., both Englishmen; it was thought I should be given a junior post in the J.E.S. They wanted the B.E.S. post to be filled by promotion and not by fresh recruitment. The former was class III (Rs. 150 - 450) while the latter was class II (Rs. 250 - 800). Dr. Srikumar Banerjee was firmly in my favour; he recommended the higher post, stressing my academic qualifications — the Premchand Raychand scholarship and research work. He pointed out the anomaly in a set-up that urged research yet was unsympathetic towards scholars. Mr. Barrow was adamant. "But I don't know this young man," he argued. "Is that at all necessary ?" remarked another young man.

There is a similar history behind the

appointment of Dr. Srikumar Banerjee himself, the only Ishan scholar in English. His first appointment was at Ripon (Surendranath) College. Professor P. C. Ghosh advised Banerjee to meet Principal H. R. James about a post at Presidency College, though it was a bit late. James who knew of Dr. Banerjee's scholarship was helpless! "I've already made my recommendations," he said. "But please remember my request," pleaded Dr. Banerjee.

"There are people who desire but do not deserve; you deserve but do not seem to desire," said James.

Principal James had just sent a note for a post to be transferred to the Darjeeling Government College. He despatched a messenger to intercept the note which was annulled. Dr. Banerjee was appointed at Presidency. Today there is more secrecy about the mode of appointment probably because of party politics.

(After a slight pause, Dr. Sengupta mused, sounding like a slow chant) : If there was anyone irreplaceable it was P. C. Ghosh. And H. M. Percival. And Sir Jagadish Chandra Bose.

● **Q** : I believe after Professor Ghosh's retirement, two English professors were summoned from 'home' to replace him?

● **A** : Yes, and Nalini Ranjan Sarkar remarked, "The man who is being replaced by two Englishmen is himself an Indian". Principal James later wrote to Professor Ghosh, "I congratulate you; or should I congratulate myself for bringing you ?"

● **Q** : Was there any important change in the status of the college while you were there ?

● **A** : Co-education was introduced in 1944. It became a purely Honours institution and rich people's children got no privileges. Merit was the only criterion for admission.

● **Q** : The administrative powers of the Principal are much reduced today. Even the

A.C.R.s are written by the departmental heads and only countersigned by the Principal. Is this a welcome change?

● **A** : The 'Heads' do enjoy certain powers not found in other colleges. Since this departmental autonomy has not harmed the academic standards of the college, I cannot say it is bad.

● **Q** : The long-standing demand for making Presidency an autonomous institution — is this demand justified?

● **A** : Oh yes, certainly. Autonomy should be granted immediately. Also the privilege to hold M. A. classes in all subjects, as it used to be.

● **Q** : Should the present custom of holding admission tests in all subjects be continued ?

● **A** : Certainly, though it wasn't there in the early days. When I joined as a student, admission to the intermediate class used to be on the basis of marks. The decision regarding admission test would depend on the discretion of the head of the department concerned even as it did previously. When I was the Head of the English Department, those who had high marks were admitted directly, while others had to write an admission test. Professor T. N. Sen

introduced admission test for all candidates. Each department had its own policy.

● **Q** : Were the students and teachers in the past interested in politics ?

● **A** : Not very much. The Teachers' Association was formed around 1954-55. But general politics were kept out of the staff room. In pre-independence days, I have no knowledge of any teacher getting involved in political movements.

● **Q** : Was the college affected during the Quit India Movement in 1942 ?

● **A** : No. During the Civil Disobedience Movement only one gate used to remain open. Principal Barrow disliked police intervention in college. In 1947 I was the partition committee secretary. The Government rewarded me for writing the report.

● **Q** : Do you approve of the routine transfer of teachers? Has it done the college any good ?

● **A** : Certainly not. It wasn't there in my time.

● **Q** : What future do you predict for Presidency College?

● **A** : I cannot foresee the future. I don't want to try. Let us hope for the best.